খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

● Vol 03 ● Issue 10 ● October 2014 ● Price Rs. 2.00

সম্পাদকীয়

'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও... জননী এসেছে দ্বারে' — এমন সব আবাহনী গানের মধ্য দিয়ে আমরা দুর্গোৎসবকে বরণ করলাম। পূজাপ্রাঙ্গণ থেকে গৃহপ্রাঙ্গণ আনন্দে আনন্দে একাকার হয়ে গেল... হয়ে উঠল মাতোয়ারা। চারদিকের মলিনতার অন্ধকার কোন এক আশ্চর্য প্রাণের প্রদীপের আলোয় মুহূর্তে হল উধাও। সংকীর্ণতা, ভেদাভেদ কোন এক পুণ্যের স্পর্শে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। চারদিক অচিরেই হয়ে উঠল পবিত্র এক মানুষের মহামিলনক্ষেত্র কোন যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়।

সেই প্রাণের প্রদীপ, পুণ্যের স্পর্শ, পবিত্রতার ছোঁয়ার কেন্দ্রস্থল এই দুর্গোৎসব। প্রতিটি মানুষ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার সুযোগ পায় এই উৎসবের মঙ্গলালোকে। চিনতে পারে নিজের মনের সৌন্দর্যকে, প্রসারতাকে, ঘুমন্ত আত্মাকে।

এমনই আনন্দযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ধবিজয়ার বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে হলেও, আমাদের মনে নিরন্তর বয়ে চলে এই আনন্দের ফল্গুধারা। নতুন করে পাব বলে আমরা মিলিত হই সব ব্যবধান ভুলে। এমন এক বিজয়া সম্মিলনী উৎসবে আমরাও মিলিত হতে চলেছি আগামী ২৬ শে অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বালিগঞ্জ ইনসটিটিউট সভা গৃহে। সেখানে আলিঙ্গনাবদ্ধ বন্ধুতা বলে উঠবে 'আবার দেখা যখন হল সখা, প্রাণের মাঝে আয়।'

২৬ অক্টোবর '১৪, সন্ধে ৬-৩০, বালিগঞ্জ ইনসটিটিউট

সান্ধ্য-সম্মেলন

মা ফিরে গেছেন কৈলাশে, জীবিকার পথগুলো আবার খুলে গেছে। চিরাচরিত ব্যস্ততায় আবার ডুব দিয়েছি। শুধুমাত্র গ্রিড কোশে বা স্মৃতিপটে দেখতে পাই পুজোর প্যান্ডেল আর অসাধারণ সেই মূর্তিগুলো। তারই রেশ নিয়ে বিজয়ার পরিসীমা পেরিয়ে আপাত অবসরে এক সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। এই মাসেরই শেষ রবিবার অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে, বালিগঞ্জ ইনসটিটিউট-এ। জগত-বান্ধবদের সপরিবার ওই শারদ-সন্ধেতে আসতে অনুরোধ করছি। আর অবশ্যই আপনার ব্যাচের বা আপনার পরিচিত জগৎ-বন্ধুদের আসতে বলুন।

আলোকচিত্র - পিপাসুদের জন্য

ফটোগ্রাফি আড্ডা

৫ নভেম্বর, ২০১৪, বুধবার, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে অ্যালমনি অফিসে

জীবন স্মৃতির মুহূর্ত-স্থিতি নিয়েই আলোকচিত্র বা ছবি। অনেকেই ছবি তুলতে ভালোবাসেন। ছবি তোলেনও; কিন্তু কী করে ভালো থেকে আরো ভালো ছবি তোলা যায় তার প্রথাগত পাঠ না থাকায় কখনও কখনও কুণ্ঠিত হয়ে থাকি। কিন্তু খুব সহজেই আমরা সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, অ্যালমনি অফিসে ছবি দেখা, নানান টিপস আদান-প্রদান, ছবি নিয়ে আড্ডা দিতে দিতে। নিজের এবং অন্য অনেক জনের ছবি দেখে আর আলোচনার মাধ্যমে আমরা ক্রমশ স্বশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারি। সুতরাং আর দেরি না করে নভেম্বর মাসের ৫ তারিখে সন্ধ্যা ৬-৩০টায় আপনি এই আড্ডায় যোগ দিন। আর মনে করে সঙ্গে আনতে হবে পুজোয় আপনি যা ছবি তুলেছেন তার থেকে বাছাই করা ১০টি ছবি।

এই সংখ্যাটি পীযূষ চ্যাটার্জি '৮২-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

মহাকাব্যের আকর হতে

অঙ্কন মিত্র ২০০২

।। শান্তার কাহিনি ।।

অযোধ্যার রাজার ভারী মন খারাপ। তাঁর রানি কৌশল্যার কেবল একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তান হয়েছে; রাজা তার নাম রেখেছেন 'শান্তা'.. কিন্তু পুত্রমুখ দর্শনের আশায় অযোধ্যার রাজা দশরথ, 'কেকয়' দেশের রাজা অশ্বপতি'র কন্যা কৈকেয়ী-কে বিবাহ করলেন। তবু দশরথের ইচ্ছেপূরণ হল না। ভগ্ন-হৃদয় রাজা তখন দাসী সুমিত্রা-কে আপন করে নিলেন। তথাপি দশরথের পুত্রলাভ অধরা রইল।

এমন সময় একদিন, অঙ্গ-দেশের রাজা রম্যপদ দশরথের কাছ থেকে তাঁর কন্যাকে ঋণ চাইতে এলেন। ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করাতে রম্যপদ জানালেন ঃ ইন্দ্রের কোপে তাঁর রাজ্যে বর্ষা বন্ধ হয়ে প্রবল খরা দেখা দিয়েছে!

দশরথ অবাক হয়ে বললেন ঃ কেন?

তখন রম্যপদ বিস্তারিত বললেন ঃ তাঁর রাজ্যের প্রান্তদেশের এক জনশূন্য অরণ্যে বিভাণ্ডক নামে এক তপস্বী বাস করতেন। একদিন ইন্দ্র ছল করে বিভাণ্ডক-কে স্বর্গের অপ্সরা দ্বারা পরীক্ষা করতে এলে ক্ষণকালের জন্য বিভাণ্ডকের মন বিক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁর শরীর থেকে তেজ নিক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে পড়ে! তৎক্ষণাৎ সে তেজ-কণা এক হরিণী খেয়ে ফেলে অন্তঃসত্ত্বা হয়; এবং সে এক শিংওয়ালা মনুষ্য শিশুর জন্ম দেয়। এর নাম হল ঋষ্যশৃঙ্গ।

অনভিপ্রেত পুত্রলাভ করে ত বিভাণ্ডক প্রচণ্ড ক্রোধিত হন এবং তিনি পণ করেন, যদি কোনো রমণী তাঁর পুত্রকে কোনোদিন বশীভূত করতে পারে, তবেই অঙ্গ দেশে আবার বর্ষা আসবে; তার আগে নয়।

এখন এই বিপদ থেকে নিষ্কন্যা রাজা রম্যপদকে একমাত্র দশরথ কন্যাই উদ্ধার করতে পারেন। তাই দশরথের অনুমতি নিয়ে শান্তাকে সেই তপবনে নিয়ে এলেন রম্যপদ, যেখানে একান্তে পিতৃ সান্নিধ্যে তপস্যারত ছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। শান্তা অতিব সুন্দরী কন্যা; রম্যপদ'র বিশ্বাস সেই একমাত্র এই বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে পারবে।

এদিকে সেই গহন অরণ্যে বিভাণ্ডক নিজ পুত্রকে সম্পূর্ণ নারী-সংস্পর্শবর্জিত ভাবে মানুষ করে তুলেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ দিনে দিনে মহাতপে পরিণত হলেও কোনোপ্রকার স্ত্রী-জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা তাঁর ছিলনা। বিভাণ্ডক নিজের পণ বজায় রাখতে পুত্রকে কখনো চোখের আড়াল করতে না। যখন রসদ সংগ্রহের উদ্দেশে অরণ্যের বাইরে যেতেন তখন ঋষ্যশৃঙ্গ'র কুটিরের চারপাশে একটি গণ্ডী কেটে যেতেন। এই গণ্ডী পেরিয়ে কোনো মানবী ত নয়ই, এমনকী কোনো গোরু, হংসী, হরিণী, মেষা। কেউই প্রবেশ করতে পারত না।

সেই গণ্ডীর এমনই তেজ যে কোনো উড়ে আসা ফুলরেণু, বীজ বা অন্য কোনো উদ্ভিজ্জ পরাগ পর্যন্ত গণ্ডীর সীমানায় এলে একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যেত। তাই ইন্দ্র শত চেষ্টা করেও আর কোনো অপ্সরা দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে স্খলিত করতে পারেননি...

এমনই একদিন, যখন বিভাণ্ডক মুনি কুটীরে নেই এমন সময়, ঋষ্যশৃঙ্গর তপভূমির অদূরে এক বৃক্ষ অন্তরাল হতে শান্তা সমধুর সঙ্গীত গাইতে শুরু করল। নারীরসবঞ্চিত ঋষ্যশৃঙ্গ এমন সুললিত কণ্ঠসঙ্গীত শুনে যারপরনাই উদ্বেলিত হল এবং আসন পরিত্যাগ করে কাতর নয়নে সঙ্গীতের উৎস সন্ধান শুরু করল। শান্তা তখন আড়াল হতে হাস্যমুখে বেরিয়ে এল। এমন অপরূপ লাস্যময়ীকে জীবনে প্রথম সাক্ষাৎ করে ঋষ্যশৃঙ্গ বাক্যহারা হয়ে গেল। শান্তা তার অবস্থা দেখে ছলনা করে বলল ঃ ''ঋষিপুত্র!.. কী দেখ আমার দিকে অমন করে?''

বিহ্বল ঋষ্যশৃঙ্গ কোনোমতে বলল ঃ ''কে তুমি অপরূপা? ... কোন ছলনায় এমনভাবে আমাকে সম্মোহিত করছ?... মনে হচ্ছে যেন, তোমাকে না পেলে এ জন্ম বৃথা!''

ঋষ্যশৃঙ্গর কথা শুনে শান্তা খিলখিল করে হেসে উঠল; তারপর বলল ঃ ''আগে এই গণ্ডী ছেড়ে বাইরে এস... তবে আমার পরিচয় দেব!''

ঋষ্যশৃঙ্গ ইতস্তত করল। পিতৃনিষেধ সে কখনও অমান্য করে না। শান্তা তার পরিস্থিতি বিচার করে বলল ''হে ঋষিপুত্র! তুমি যে প্রকৃতির গর্ভে বসে জ্ঞান-তপস্যা করো, আমি সেই প্রকৃতিরই অংশ; তাই আমার রহস্য অনুসন্ধানে ওই সামান্য গণ্ডী লঙ্ঘন করলে তোমার পিতৃবাক্যের এমন কিছু অবহেলা হবে না!''

মোহিত ঋষ্যশৃঙ্গ এই কথার পর দ্রুত গণ্ডী লঙ্ঘন করে শান্তার নিকট চলে এল।

অতঃপর স্বর্গ হতে ইন্দ্র পুনরায় অঙ্গদেশে বরুণ বর্ষণ করলেন। বিভাণ্ডক আপন পণে চ্যুত হয়ে আরো গভীর অরণ্যে মনের দুঃখে তপস্যা করতে চলে গেলেন।

এর কিছুদিন পর শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

অতঃপর পত্নী শান্তার অনুরোধে ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্র-তৃষ্ণার্ত দশরথের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করলেন অযোধ্যায়। যজ্ঞান্তে দিব্য ঘৃত'র কলস হতে কৌশল্যা ও কৈকেয়ী সমার্ধ পরিমাণ ঘৃত গ্রহণ করলেন। তাঁরা দু'জনেই আবার নিজ ভাগ হতে এক তৃতীয়াংশ সুমিত্রাকে দান করলেন। এই সময় একটি কাক কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর ঘৃত হতে এক খণ্ড ছোঁ মারল। সেই খণ্ড দুটি যথাক্রমে অঞ্জনা ও কৈকেশীর মুখে গিয়ে পড়ল। ফলে ওই দিব্য ঘৃত সেবনে কৌশল্যার কোলে রাম ও কৈকেয়ীর কোলে ভরত নামে দুই পুত্র জন্ম নিল। সুমিত্রার গর্ভে দুই যমজ সন্তান লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মাল। ওই দিব্য ঘৃতর গুণেই অঞ্জনা হলেন হনুমান-এর জননী এবং কৈকেশী হলেন বিভীষণ-এর মাতা।

অর্থাৎ বলা চলে, মহাকাব্যের উপেক্ষিতা অনামা দশরথ কন্যা শান্তই পরোক্ষে রামায়ণ চরিতের মূল সূতিকা...!''

(তথ্যসূত্র দেবদূত পট্টনায়ক-এর 'সীতা')

সাহিত্য পরিচয়

বিশ্বসাহিত্য এবং দেশীয় সহিত্য থেকে সংগ্রহ করে আনা কিছু স্ফুলিঙ্গ।

আঁধি

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জমিদার অভয়শঙ্কর অত্যন্ত রাশভারী মানুষ, সবাই তাঁকে মান্যি করে চলে। জমিদার পত্নী লীলার মৃত্যুর পর অভয়শঙ্কর একমাত্র পুত্র নিখিলকে মাতৃস্নেহে মানুষ করতে লীলারই দূর সম্পর্কের বোন সুষমাকে বিবাহ করেন। কিন্তু অভয়শঙ্করের সমস্ত স্বত্তা জুড়েই লীলার স্মৃতির আধিপত্যের জন্য সুষমা তাঁর মনের নাগাল পায়নি। প্রথম সন্তান নিখিলকে তিনি সবসময়ই চোখে চোখে রাখতেন। নতুন মা সুষমা-ও মা হারা নিখিলের কল্যাণ চিন্তায় মগ্ন আর নিখিলও সুষমার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু অভয়শঙ্করের কড়া শাসনের ফলে স্নেহ পিপাসিত দুটি হৃদয় কোনোক্রমেই এক হতে পারেনি।

নিখিল একদিন ঝড়বাদলের সন্ধ্যার এক দরিদ্র পল্লীবাসীর কুটিরে আশ্রয় নেয়, সেখানেই ছোট্ট সোনার সাথে তার সখ্যতা হয়। একে অন্যকে অনুভব করতে শুরু করে। অথচ একে অপরের বাড়ি যেতে পারছে না, অভয়শঙ্করের কড়া নজরদারি তাদের অন্তরায় হয়ে উঠেছে। অনেক সাহস করে সোনা তার বাবাকে নিয়ে নিখিলের বাড়িতে তাকে দেখতে আসে। বিপরীত জমিদার অভয়শঙ্করের বিধিনিষেধ আরো কঠোর হয়ে ওঠে, যে ঘেরাটোপ পেরিয়ে সোনা বা নিখিল কেউই একে অপরের কাছে যেতে পারে না। তাদের দেখা-সাক্ষাত একেবারেই বন্ধ হল। মানসিক অশান্তিতে সোনা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং নিখিলকে স্মরণ করতে করতেই জগত সংসার থেকে চলে যায় সোনা।

এই নতুন কলমে বিশ্বসাহিত্য এবং দেশীয় সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করে আনা কিছু স্ফুলিঙ্গ। প্রতি সংখ্যায় খেয়া-য় প্রকাশ পাবে, এ কলমের জন্য আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন।

অন দি ইভ (On the Eve)

আইভান তুর্গেনিফ

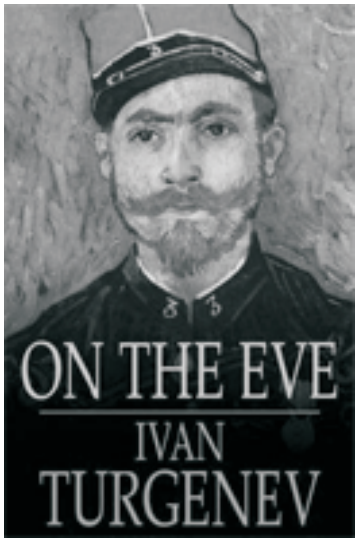

রুশ মহিলা হিসাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন হেলেন। আইভান তুর্গেনিফ রচিত রুশ উপন্যাস অন দি ইভ-এর নায়িকাই এই হেলেন।

হেলেন তার আটপৌরে গৃহস্থালির কাজ কর্মে সুখ পাচ্ছিলেন না। সেই অনুভূতির কথা তার ডায়েরিতে উঠে আসে — 'শুধু ভালো হয়ে লাভ নাই, কিছু ভালো কাজ করা প্রয়োজন।' কিন্তু তখনও পর্যন্ত দু'জন মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল, এঁদের মধ্যে একজন লঘু চরিত্রের শিল্পী সুবিন আর অপর ব্যক্তি বার্সেনেফ অন্যমনস্ক আপনভোলা অধ্যাপক। যাঁরা কেউই হেলেনের এই মানসিক অতৃপ্তি দূর করে উঠতে পারেননি। এইভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল, বাড়ছিল মানসিক অশান্তি, এমন এক অস্থির সময়ে হেলেনের জীবনে আসে তৃতীয় পুরুষ জনৈক বুলগেরিয়ান দেশপ্রেমিক — বুলগ্যারেফ। দিন এগিয়ে চলেছে প্রাকৃতিক নিয়মে, একদিন বুলগারেফ বুঝতে পারলেন যে তিনি হেলেনকে ভালোবেসে ফেলেছেন। দেশপ্রেমিকের দেশহিতে খামতি পড়তে পারে, দেশ প্রেমের ব্রত ভঙ্গ হবে এই ভেবে তিনি তখনই হেলেনের উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে মুক্ত হতে চাইলেন।

বুলগ্যারেফের চলে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে এক প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে, জীবনে ভালো কিছু কাজ করার তাড়নায় অতৃপ্ত হেলেন বুলগ্যারেফ-এর পাশে দাঁড়ালেন। হেলেন বুলগ্যারেফকে তার মনভাব ব্যক্ত করে জানলেন যে বুলগ্যারেফ-এর সাধনাকেই সে তার নিজের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন।

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক টুর্গানিফের আগে অন্য কোনো সৃজনশীল কলমে মহিলাদের রাজনৈতিক আন্দোলন বা দেশপ্রেমের অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেননি, সে দিক দিয়ে এই পথের পুরোধাই হেলেন।

শারদোৎসবে নৌ-ক্রীড়া

জ্যোতিভূষণ চাকী

(আমাদের শিক্ষক মহাশয় জ্যোতিভূষণ চাকীর অসামান্য রসবোধের গুণগ্রাহী আমরা, ছাত্র বয়স থেকেই। এই রচনায় শরৎকালের, নৌকা-বাইচ এর, সাহিত্য রসসিক্ত, তথ্যবহুল বিবরণে বস্তুত তাঁকেই স্মরণ করা...)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ও বাংলায় প্রচলিত কাহিনিটি এই আঠারো শতকের গোড়ার দিকে এক গাজি পির মেঘনা নদীর পাড়ে বসে অন্য পাড়ের ভক্তবৃন্দকে তাঁর কাছে আসতে ডাকেন হাতছানি দিয়ে, তখন ঘাটে কোনো নৌকো ছিল না; অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা ডিঙি নৌকো করেই তারা পিরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। নৌকোটি উলটোনোর দশা হল। এই দুর্দশা দেখে কাছের ও দূরের অনেক নৌকো গাজিপিরের নাম ধরে ছুটে এল। নৌকোর সারি তখন একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। এই পাল্লার নেশা থেকেই নাকি নৌকো-বাইচের উৎপত্তি। এ বাংলায় প্রচলিত একটি কাহিনি থেকে জানা যায়, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময়ে স্নানযাত্রীদের নিয়ে বহু নৌকোয় তোলপাড় সৃষ্টি হত। স্নানযাত্রার সময়ে মাঝিমাল্লারা যাত্রীদের নিয়ে এক ধরনের প্রতিযোগিতার আনন্দপেত। এর থেকেই কালক্রমে নৌকা-বাইচের উদ্ভব। আবার অনেকে বলেন, নবাব-বাদশাদের নৌবাহিনীদের নৌ-চালনার নানা আঙ্গিক থেকেই নৌকা-বাইচের জন্ম। যুদ্ধে বা দস্যুদমনের উদ্দেশ্যে দ্রুত নৌ-চালনার প্রয়োজন থেকেও নৌকা-বাইচের উৎপত্তি হতে পারে। আমাদের মনে হয়, নৌকোর সঙ্গে আমাদের প্রাণের যে সম্পর্ক, নৌকা-বাইচ সেই প্রাণলীলারই প্রকাশ। নৌকোর কত নাম — ঝড়ের পাখি, পাখিরাজ, পঙ্খিরাজ, সাইমুন, তুফানি, ময়ূরপঙ্খি, অগ্রদূত, সোনার তরি আরও কত কী। এগুলো তো আদরের নাম, গঠনরত নামগুলো পাওয়া যাবে সন্নিবেশিত চিত্রে। নৌকা-বাইচের জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছে। প্রাদেশিক, সর্বভারতীয়, আন্তর্জাতিক সবরকমের প্রতিযোগিতাই এখন আয়োজিত হয়। সেই সঙ্গে নৌশিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে নানা রকমের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

এই নৌকা-বাইচ শারদোৎসবে হলেও সুন্দরবন অঞ্চলে তা বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে, বিশেষ করে হয় মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে। পাবনার স্মৃতি দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি।

পুজোর আগ দিয়ে দেখতাম, অনেক নৌকো উলটো করে রাখা হয়েছে মেরামতির জন্যে। সেখানে ওস্তাদ মিস্তিরিরা ঠকাঠক শব্দে কাঁটা ও পেরেক ঠুকে সরগরম করে রেখেছিল পরিবেশটিকে। নৌকা-বাইচে এইসব নৌকোই ব্যবহার হবে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী — দেখতে দেখতে পুজো শেষ। দর্পণ বিসর্জন হয়ে গেল। এবারে আমরা ছোটোরা পদ্মাপাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছি জোড়া নৌকায় প্রতিমা বিসর্জন। পুজো শেষ হয়ে গেল দেখে আমাদের মন কী খারাপ। কিন্তু আর এক আনন্দ এই মনখারাপের ভাবটাকে একটু কমিয়ে দিত, সেটা হচ্ছে নৌকা-বাইচ; পদ্মার ধারে দাঁড়িয়ে এই নৌকা-বাইচ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। সে দৃশ্য ভোলবার নয়। এমনিতেই যা সুন্দর, শৈশবে তা সুন্দরতর। শৈশব-স্মৃতির আলোকে পাবনার যামিনীসুন্দরী দেবীর দুর্গামণ্ডপের ঢাকের আওয়াজ আর পদ্মা বাইচের ঢাকের আওয়াজ মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.